প্রেমিক আইনস্টাইন

প্রদীপ দেব

১
হাতে গোনা যে কজন বিজ্ঞানীর নাম পৃথিবীর বেশির ভাগ শিক্ষিত মানুষ জানেন অ্যালবার্ট আইনস্টাইন তাঁদেরই একজন। আইনস্টাইনের থিওরি অব রিলেটিভিটি বা আপেক্ষিকতার তত্ত্বের মতো এত বেশি প্রচার আর কোন তত্ত্বই পায়নি এখনো। গল্প উপন্যাস বা টেলিভিশনের নাটকে পদার্থ বিজ্ঞানের কোন প্রসঙ্গ এলেই দেখা যায় আইনস্টাইনের একটি বিশেষ সমীকরণের উল্লেখ করা হয়। স্টিফেন হকিং-এর বিশ্ববিখ্যাত বই A Brief History of Time-এ একটি মাত্র সমীকরণের উল্লেখ আছে আর তা হলো আইনস্টাইনের। আমাদের বাংলা সাহিত্যে যেমন রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিয়ে সহজে কিছু করা যায় না, সেরকম আধুনিক বিজ্ঞানের মৌলিক শাখায় আইনস্টাইন ছাড়া পথ চলা বেশ কষ্টকর। বিজ্ঞানী অ্যালবার্ট আইনস্টাইন সম্পর্কে আমাদের কৌতূহল ক্রমশ বাড়ছে। সেই কৌতূহল তাঁর গবেষণার জগৎ পেরিয়ে এখন ব্যক্তিগত ভুবনে ঢুকে পড়েছে। কেমন ছিল আইনস্টাইনের একান্ত ব্যক্তিগত জীবন? নারীর প্রতি কেমন আচরণ করতেন এই অনন্যসাধারণ প্রতিভার মানুষটি? তাঁর জীবনে প্রেম ভালোবাসার ভূমিকা কেমন ছিল? তিনি নিজে কীভাবে মূল্যায়ন করতেন প্রেম ভালোবাসা এইসব নিয়ম মেনে না চলা অবৈজ্ঞানিক বিষয়গুলোর?

২
'অবশ্যই কাউকে না কাউকে ভালোবাসতে হয় আমার।' আইনস্টাইনের জীবনে তাঁর এই কথাটি খুবই সত্য; একটু বেশি মাত্রায় সত্য। সারাজীবনই তিনি ভালোবেসে গেছেন, ভালোবাসা পেতে চেয়েছেন; পেয়েছেনও। কিন্তু ভালোবাসার সদ্ব্যবহার তিনি সবসময় করেছেন বলে মনে হয় না। মেরি, মিলেইভা, এলসা, হেলেন - অনেক নারী এসেছে তাঁর জীবনে। কৈশোর কাটতে না কাটতেই তিনি পেয়েছেন প্রথম প্রেমের স্বাদ। ষোল বছর বয়সে পরিচয় মেরির সাথে। মেরি উইন্টেলার - অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের প্রথম প্রেম। কৈশোরের এক মন খারাপ করা বিকেলে মেরির সাথে দেখা অ্যালবার্টের, মেরিদের বাড়িতে। পরিচয়ের সূত্রপাত খুঁজতে আরেকটু পেছনের ঘটনার দিকে যেতে হচ্ছে।

৩
কিছুদিন থেকেই নানা কারণে মন খুব খারাপ হয়ে আছে অ্যালবার্টের। তাকে ফেলে তাদের পুরো পরিবার চলে গেছে ইটালির মিলানে। পরিবার মানে তার মা পলিন আইনস্টাইন আর বাবা হারম্যান আইনস্টাইন। ছোটবোন মায়াও গেছে তাদের সাথে। কেবল তাকেই রয়ে যেতে হয়েছে জার্মানির মিউনিখে। স্কুলের পড়াশোনা শেষ না করে অ্যালবার্টকে ইটালি নিয়ে যেতে চাননি তার মা-বাবা। তাঁদের না গিয়ে উপায় ছিল না। তাঁদের ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যবসা ভালো চলছিলো না মিউনিখে।

মিউনিখে বাবার বন্ধুর পরিবারে থাকতে মোটেও ভালো লাগছিল না অ্যালবার্টের। তার ওপর স্কুলের যন্ত্রণা। অ্যালবার্ট মিলিটারী কায়দার স্কুল কখনোই পছন্দ করতে পারেনি। স্কুলের স্যাররা সুযোগ পেলেই নানারকম অপমান করতে ছাড়েন না। ইহুদি পরিবারের ছেলে হওয়াতে তাকে যেন বেশি করেই অপমান করা হয়। কোন রকমে চোখ কান বুজে মাস ছয়েক কাটালো। কিন্তু আর পারা গেলো না। একদিন কাউকে কিছু না জানিয়ে মিলানগামী ট্রেনে চড়ে বসলো অ্যালবার্ট।

মা-বাবার সাথে বিশেষ করে মায়ের সাথে কথা না বলে কোন সিদ্ধান্ত এর আগে নেয়নি অ্যালবার্ট। মা পলিন খুব কড়া মহিলা। কোন রকম বিশৃঙ্খলা তিনি সহ্য করেন না। কিন্তু অ্যালবার্ট যে পারছিলো না আর। ছেলে স্কুলের গন্ডিও পার হতে পারবে না চিন্তা করতেই কেমন যেন হয়ে গেলেন পলিন। কড়া চোখে ছেলের দিকে তাকাতেই অ্যালবার্ট বুঝে গেলো মাকে সামলানোর দায়িত্বও তার। 'চিন্তা করো না মা। আমি বাড়িতে পড়েই পলিটেকনিকে ভর্তির পরীক্ষা দিতে পারবো'- মাকে আশ্বস্ত করতে চাইলো অ্যালবার্ট। জুরিখের ফেডারেল ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি বা সংক্ষেপে পলিটেকনিক- ইউরোপের সেরা বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। সেখানে ভর্তির সুযোগ পাওয়া এত সহজ নয়। ছেলের মেধা আছে তা পলিন জানেন, কিন্তু শুধু ঘরে বসে পড়েই সে ভর্তি পরীক্ষায় পাস করে যাবে সে আশা কিছুটা দুরাশা। তাছাড়া স্কুল পাসের সার্টিফিকেট ছাড়া তাকে ভর্তি পরীক্ষায় বসার সুযোগও তো দেবেনা। কিন্তু এখন তো আর কিছু করা যাবে না। ছেলের গোঁ তিনি জানেন। তিনি খোঁজ নিতে লাগলেন প্রভাবশালী কাউকে পাওয়া যায় কিনা যিনি সাহায্য করতে পারবেন এ ব্যাপারে।

গুস্তাভ মেইয়ার জুরিখের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। জুরিখে থাকতে আইনস্টাইন-পরিবারে আসা যাওয়া ছিল মেইয়ার পরিবারের। পলিন গুস্তাভ মেইয়ারকে ধরলেন যদি কোন ভাবে অ্যালবার্টের ভর্তির ব্যাপারে কিছু করা যায়। পলিটেকনিকের ডাইরেক্টর এলভিন হার্ঝোগের সাথে গুস্তাভের পরিচয় আছে। গুস্তাভ ডাইরেক্টরকে বোঝালেন যে এলবার্ট একজন অনন্য প্রতিভার অধিকারী ছেলে, সে ষোল বছরেই আঠারো বছরের স্কুলপাসদের চেয়ে বেশি এগিয়ে আছে। শুধু শুধু তাকে আরো দুবছর স্কুলে ফেলে রাখলে দেশেরই ক্ষতি। ডাইরেক্টর বুঝতে পারলেন গুস্তাভের উদ্দেশ্য। ভর্তি পরীক্ষার আগে এরকম অনেক অনুরোধের ঠেলা সামলাতে হয় তাঁকে। তিনি জানিয়ে দিলেন ভর্তি পরীক্ষা দেবার সুযোগ দেয়া যাবে। কিন্তু ভর্তি পরীক্ষায় অবশ্যই পাস করতে হবে। সমস্ত দায়িত্ব এসে পড়লো অ্যালবার্টের ঘাড়ে। পাস করতে পারলে সে সত্যি সত্যি জিনিয়াস হয়ে যাবে। কিন্তু পাস করতে পারলো না অ্যালবার্ট। গণিত আর পদার্থবিজ্ঞানে সে খুবই ভালো করেছে। কিন্তু সাধারণ জ্ঞানে এতটাই খারাপ করেছে যে আর মুখ দেখানোর উপায় নেই। আবার স্কুলে ফিরে যাওয়া ছাড়া আর কোন পথ রইল না অ্যালবার্টের। কিন্তু আগের স্কুলে ফিরে যেতে কিছুতেই রাজি হলো না সে।

৪

২৬ অক্টোবর ১৮৯৫ তারিখে এলবার্ট ভর্তি হয়েছে আরাউ এর একটি টেকনিক্যাল স্কুলের থার্ড ইয়ারে। সুইজারল্যান্ডের আরাউ মিউনিখের মাত্র বিশ মাইল পশ্চিমে। এই স্কুলের পরিবেশ জার্মানির স্কুলের চেয়ে অনেক ভালো। এখানের পড়াশোনা শেষ করতে পারলে ফেডারেল ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজিতে ভর্তির জন্য আরেক বার চেষ্টা করা যাবে। স্কুলের প্রফেসর ইয়স্ট উইন্টেলারের বাড়িতে লজিং এর ব্যবস্থা হয়েছে অ্যালবার্টের। পরিবার থেকে দূরে একা একা থাকাটাই তাহলে তার নিয়তি। মন খারাপ থাকার ফলে প্রথম কিছুদিন সে খেয়ালই করেনি যে তিনটি ফুটফুটে তরুণী মেয়ে আছে এই বাড়িতে।

রোজা, অ্যানা, মেরি; প্রফেসর ইয়স্ট উইন্টেলারের তিন কন্যা। মেরি সবার ছোট, সবার চেয়ে সুন্দরী। আঠারো বছর পেরিয়েছে ক'দিন আগে। তার চেয়ে দুবছরের ছোট অ্যালবার্টকে মেরি প্রথমে কেমন একটা স্নেহের দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করেছে। অ্যালবার্ট মাঝে মাঝে তার ঘরে একা একা বেহালা বাজায়। ঘরের বাইরে থেকে শুনেছে মেরি। অ্যালবার্টের বেহালার হাত দারুন তা মেরি বুঝতে পেরেছে। মেরি নিজে বাজায় পিয়ানো। পরিচয় হতে আর সময় লাগলো না। কিছুদিনের মধ্যেই দেখা গেলো অ্যালবার্ট মেরি জুটিতে বেহালা-পিয়ানোর যুগল বাজনা বাজাচ্ছে। এই সুর অ্যালবার্টের প্রাণে দোলা লাগালো অন্যভাবে। অ্যালবার্ট মেরির প্রেমে পড়ে গেলো। এই প্রেমে তারুণ্যের উচ্ছাস প্রবল।

অ্যালবার্ট তার মাকে চিঠি লিখলো। অনেকদিন পরে ছেলের খুশি দেখে খুশি হলেন পলিন আইনস্টাইন। মেরির মায়ের নামও পলিন। অ্যালবার্ট মেরির মা কে মা ডাকতে আরম্ভ করলো। মেরি অ্যালবার্টের ঘর গুছিয়ে রাখা থেকে শুরু করে জামা কাপড়ও কাচতে শুরু করলো। মেরির প্রেম ভালোবাসার সাথে এরকম সেবা যত্ন পেয়ে অ্যালবার্ট তো গদ গদ। মেরির সেবা যত্নের বিবরণ দিয়ে মাকে চিঠি লিখলো। পলিনও মেরির প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে একটা চিঠি লিখলেন। মেরি চিঠিটা পেয়ে ভাবলো অভিভাবক পর্যায় থেকে তাদের প্রেমের স্বীকৃতি পাওয়া গেলো।

তারপর কিছুদিন প্রেম শুধু প্রেম। আরাউ শহরতলির একপ্রান্তের জুরা পাহাড়ে, আরি নদীর ধারে, বিস্তীর্ণ প্রান্তরে হাতে হাত রেখে ঘুরে বেড়ালো অ্যালবার্ট আর মেরি। অ্যালবার্টের শারীরিক গঠন মজবুত। মেরিকে সে একটা বাচ্চা মেয়ের মতো 'আমার ছোট্ট সোনা' বলে ডাকে। মেরির কাছে অ্যালবার্ট হয়ে গেলো 'আমার প্রাণের দার্শনিক'। চারমাস পরে কিছুদিনের ছুটিতে অ্যালবার্ট ইটালি গেলে সময় যেন কাটেনা মেরির। অ্যালবার্ট চিঠি লিখেছে ইটালি থেকে। কী কবিত্বময় সে চিঠির ভাষা, 'আমার ছোট্ট পরী, —— সারা পৃথিবী আমার জন্য যা করেছে তুমি করেছো তার চেয়ে বেশি। তুমি আমার সূর্যালোক।' অ্যালবার্ট লিখেছে তার সময় কাটছে না মিলানে। ছুটি শেষে অ্যালবার্ট ফিরে এলো। কিন্তু দ্রুত শেষ হয়ে গেলো অ্যালবার্টের স্কুলের পরীক্ষা। এবার জুরিখের পলিটেকনিক। ১৮৯৬'র অক্টোবরে সেখানে ক্লাস শুরু করবে অ্যালবার্ট। যাবার আগে মেরির সাথে অনেক পরিকল্পনা করলো এলবার্ট। ভবিষ্যতের অনেক রঙিন স্বপ্ন দেখলো, দেখালো। তারপর চলে গেলো।

৫

আরাউতে মেরির সময় কাটতেই চায় না। অ্যালবার্টের কোন খবর পাচ্ছে না সে। পড়ার চাপে অ্যালবার্ট আসতে পারছে না হয়তো, কিন্তু একটা চিঠিও আসে না কেন? মেরি তো আর পারে না অপেক্ষার দেরি সইতে। নভেম্বর মাসে একটা স্কুলে

পার্টটাইম পড়ানোর চাকুরি নিয়ে ওল্‌সবার্গ চলে গেলো মেরি। অ্যালবার্ট বলেছিল ওল্‌সবার্গে গেলে সে নিয়মিত চিঠি লিখবে। কোথায় চিঠি? স্কুলের ছোট ছোট বাচ্চাদের মাঝে মেরি খুঁজতে লাগলো অ্যালবার্টের মুখ। ঝাঁকড়া চুলের গাট্টাগোট্টা এক ছাত্র মেরির আদর কাড়তে লাগলো অ্যালবার্টের মুখের গড়নের সাথে তার মুখের সামান্য মিল থাকার সুবাদে। অনেকদিন পরে একটা চিঠি এলো অ্যালবার্টের। কত খুশি হলো মেরি। অ্যালবার্ট লিখেছে সে আসতে চায় আরাউতে। আরাউতে আসা মানে তো মেরির কাছেই আসা, মেরি ভাবে। কিন্তু একটা অনুচ্ছেদে এ কী লিখেছে অ্যালবার্ট! মেরির সাথে যোগাযোগ রাখতে চায় না? কেন অ্যালবার্ট, কেন? মেরির প্রশ্নের উত্তর নিয়ে কোন চিঠি আর আসে না অ্যালবার্টের কাছ থেকে। মেরির মন মানে না। অ্যালবার্টের অসুখ করলো নাকি? মাকে খবর নিতে বলে মেরি। না, অ্যালবার্টের কিছু হয়নি। সে এখন খুব ব্যস্ত জুরিখের পলিটেকনিকের পড়াশোনায় এবং আরো একটি কাজে।

৬

জুরিখের ফেডারেল ইনস্টিউট অব টেকনোলজিতে অ্যালবার্টের ক্লাসে একজন মাত্র মেয়ে। শান্ত, চুপচাপ, তন্বী মেয়েটি একবারো তাকায়না তাদের দিকে। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটে। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখার মতো সুন্দরী সে নয়। কালো চুল, কোনরকম যত্নের ছাপ নেই তাতে। ক্লাসের সব ছেলেরাই দেখে মেয়েটিকে; একজন মাত্র মেয়ে ক্লাসে থাকলে তাকে সহপাঠিনীর চেয়ে মেয়ে হিসেবেই দেখতে অভ্যস্ত ছেলেরা। অ্যালবার্ট একটু বেশি পরিমাণেই লক্ষ্য করছে মেয়েটিকে। মেরির শারীরিক সৌন্দর্যের সাথে এই মেয়ের কোন তুলনাই চলে না। কিন্তু কেন এত আকর্ষণ অনুভব করছে অ্যালবার্ট? পদার্থবিজ্ঞান আর গণিতে তুখোড় মেয়েটি। এই কারণেই কি? পড়াশোনার বাইরে আর কোন কিছুতেই কি কোন আগ্রহ নেই মেয়েটির?

মিলেইভা মেরিক (১৮৯৬)

না, পড়াশোনার বাইরে আর কোন কিছু নিয়ে ভাবতে চায়না মিলেইভা মেরিক। মিলেইভা জানে এ প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হবার জন্য তাকে অনেক কষ্ট করতে হয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানের ইতিহাসে এই ১৮৯৬ সাল পর্যন্ত পাঁচ জন মাত্র মেয়ে পড়াশোনা করেছে। সে পঞ্চম। শুধু এখানে কেন সার্বিয়ার জাগরেভ রয়েল ক্লাসিক্যাল স্কুলে পড়তেও তাকে অনেক কষ্ট করতে হয়েছে। অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান রাজ্যে সে-ই প্রথম মেয়ে যে ছেলেদের সাথে একই ক্লাসে বসে পড়ার সুযোগ পেয়েছে ১৮৯১ সালে। তার জন্য পদার্থবিজ্ঞান আর গণিতে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখানোর পরেও স্পেশাল পারমিশান নিতে হয়েছে ষোড়শী মিলেইভাকে। তার বাবা মিলোস মেরিক একজন উচ্চপদস্থ সরকারি অফিসার বলেই এতসব স্পেশাল ব্যবস্থা করা গিয়েছে। তখন থেকেই মিলেইভার স্বপ্ন একদিন অনেক বড় হবে। সারবোর্নের মেরিয়া স্কলোদভস্কা (মেরি কুরি) তার আদর্শ। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছে মিলেইভা সারাজীবন জ্ঞান বিজ্ঞানের সাধনা করে যাবে। কোনদিনও বিয়ে করবে না। মেয়েরাও যে ছেলেদের মতো যে কোন পেশায় ভালো করতে পারে তা সে দেখিয়ে দেবে।

স্কুলের পড়াশোনা শেষ করে মিলেইভা ভেবেছিল ডাক্তার হবে। তার অসাধারণ রেজাল্ট স্কুলের সব পরীক্ষায়। জুরিখ ইউনিভার্সিটির মেডিকেল স্কুলে ভর্তি হতে কোন সমস্যাই হলো না। ইউরোপের এই ইউনিভার্সিটিতে মেয়েদের ভর্তি হবার সুযোগ করে দেয়া হয়েছে ১৮৬৭ সাল থেকে। মিলেইভা মেডিকেল স্কুলে ক্লাস করতে শুরু করলো ১৮৯৬র জুনে। কিন্তু সমস্যা দেখা দিলো অন্যভাবে। মিলেইভার ক্লাসে আর কোন মেয়ে নেই। ক্লাসের ছেলেরা মিলেইভাকে নানা ভাবে হেনস্তা করতে লাগলো। কনজেনিটাল হিপ ডিফরমিটির কারণে তাকে খুড়িয়ে খুড়িয়ে হাঁটতে হয়। সেটা নিয়েও বিদ্রুপ করে ছেলেরা যারা নাকি মেডিকেল স্কুলে পড়তে এসেছে ডাক্তার হবার জন্য। মিলেইভা সর্বশক্তি দিয়ে সহ্য করে যেতে চাইলো, কিন্তু যখন এনাটমির ব্যবচ্ছেদ ক্লাসে তার নারী শরীর নিয়ে ছাত্রদের নোংরা আলোচনায় শিক্ষকরাও যোগ দিতে আরম্ভ করলেন

তখন আর পারা গেলো না। মিলেইভা ছেড়ে দিলো মেডিকেলের পড়াশোনা। অক্টোবরে এসে ভর্তি হলো পলিটেকনিকে। এখানের ভর্তি পরীক্ষায় পাস করা সহজ নয়। কিন্তু মিলেইভার কোন অসুবিধাই হয়নি। সে গণিত ও পদার্থবিজ্ঞানের পাশাপাশি ইতিহাস ভূগোল সাধারণ জ্ঞানেও চৌকস। কিন্তু মনে মনে সে ভয় পাচ্ছে এখানেও একমাত্র মেয়ে হওয়াতে ছেলেদের টিটকিরি সইতে হবে তাকে। সে ভেবে রেখেছে কারো সাথে কোন কথাই বলবে না এখানে।

প্রথম বার্ষিক পরীক্ষায় দেখা গেলো মিলেইভা ক্লাসের সেরা স্টুডেন্ট হয়ে গেছে। অ্যালবার্ট বুঝতে পারলো এই মেয়ের মন জয় করতে হলে আবেগ দিয়ে কাজ হবে না। গণিত আর পদার্থবিজ্ঞানের সমস্যা নিয়ে আলোচনা শুরু করতে হবে। তাই শুরু হলো। দ্বিতীয় বর্ষের একটা সেমিস্টার পড়ার জন্য মিলেইভা হাইডেলবার্গ চলে গেল। শুরু হলো অ্যালবার্ট আর মিলেইভার চিঠি লেখালেখি। অ্যালবার্টের চিঠিতে বিজ্ঞানের খবরের পাশাপাশি হৃদয়ের খবরও জায়গা করে নিতে লাগলো। কতদিন আর চুপ করে থাকবে মিলেইভা। অ্যালবার্টের প্রতিভা আর পদার্থবিজ্ঞানের নতুন নতুন আইডিয়ায় সে ইতোমধ্যেই মুগ্ধ হতে শুরু করেছে। চিঠি লিখতে লিখতে প্রেম হয়ে গেলো। ১৮৯৯র শুরুতে জুরিখে ফিরলো মিলেইভা। এবার আর কোন জড়তাই নেই অ্যালবার্ট আর মিলেইভার। অ্যালবার্টের কাছে মিলেভা হয়ে গেলো 'ডলি', আর মিলেইভার কাছে অ্যালবার্ট হলো 'জনি'।

মিলেইভার পরিবার থেকে তেমন কোন বাধা এলো না। মিলেইভার বাবা মিলোস মেরিক জানেন বিয়ের বাজারে মিলেইভার দর খুব বেশি নয়, কারণ মিলেইভা সুন্দরী নয়, মিলেইভার শারীরিক খুঁত আছে, আর সবচেয়ে বেশি যেটা অযোগ্যতা বিয়ের বাজারে তা হলো মিলেইভা বিদূষী। ইউরোপের কোন ছেলেই বিদূষী মেয়ে বিয়ে করতে চায় না। সেক্ষেত্রে মেয়ে যদি নিজেই কাউকে পছন্দ করে সেটা তো খুশির কথা। কিন্তু ভয়ানক চটে গেলেন অ্যালবার্টের মা পলিন আইনস্টাইন। মিলেভাইকে না দেখেই তিনি হাজারো খুঁত বের করতে লাগলেন মিলেইভার। মিলেইভা অ্যালবার্টের চেয়ে চার বছরের বড়; সে তো বুড়ি। তার ছেলেমেয়ে হবে? তার উপর খোড়া। সে জার্মান নয়, স্লোভিয়ান। মিলেইভা ইহুদি নয়। অইহুদি মেয়ে কীভাবে বিয়ে করান ছেলেকে? সবচেয়ে বড় ব্যাপার হলো এই মেয়ে তো বই পড়তে পড়তে নিজেই একটা বই হয়ে গেছে। 'ছেলেতো বিয়ে করবে একটা মেয়েকে, বইকে নয়।' পলিন গজগজ করতে লাগলেন। অ্যালবার্টের বাবা কোনদিনই স্ত্রীর অবাধ্য হননি। এখানেও চুপ করে রইলেন। ছোটবোন মায়া তার দাদা অ্যালবার্টকে খুব ভালোবাসে। সে মাকে বোঝাতে চেষ্টা করলো, কিন্তু ধমক খেয়ে দরজা বন্ধ করে কাঁদা ছাড়া আর কিছু করতে পারলো না।

৭

অ্যালবার্ট মিলেইভা কিন্তু বিয়ের কথা তখনো ভাবেনি। মিলেইভার মন বিক্ষিপ্ত। যতই দিন যাচ্ছে অ্যালবার্ট বদলে যাচ্ছে। নিজের ব্যাপারটা অ্যালবার্ট যত ভালো বোঝে, মিলেভার ব্যাপারটা সে বুঝতেই চায় না। দুজনে যখন একসাথে তৈরি করতে বসে ক্লাসের পড়া, অ্যালবার্ট চায় মিলেইভা তার জন্য কফি তৈরি করে দিক। নিজে বইয়ে মুখ গুঁজে বসে থাকে আর এটা ওটা এগিয়ে দেবার জন্য হুকুম চালায়। অ্যালবার্টের জন্য রান্নাও করতে হয় তাকে। মিলেইভা ভেবে পায় না বিয়ের আগেই তাকে বৌ মনে করছে নাকি অ্যালবার্ট। অ্যালবার্ট নিজের জামাকাপড়ও নিজে কাচতে পারে না। মিলেইভা অ্যালবার্টের জামাকাপড় কাচতে শুরু করবে এখনি? কক্ষনো না। এলবার্ট তার ময়লা জামাকাপড় পোস্ট করে পাঠিয়ে দেয় মেরির কাছে। মেরির কথা সে বলেনি মিলেইভাকে। মিলেইভা শুধু জানে যে অ্যালবার্ট একসময় থাকতো মেরিদের বাড়িতে। অ্যালবার্ট মেরিকে চিঠি লেখেনা, কিন্তু নিজের ব্যবহারের ময়লা জামাকাপড় তাকে পাঠিয়ে দেয়। আর মেরিও তা ধুয়ে শুকিয়ে ইস্ত্রি করে পাঠিয়ে দেয় অ্যালবার্টকে। অ্যালবার্টের দেখাশোনা করতে করতে অনেক সময় চলে যায় মিলেইভার, অথচ তাকেও অ্যালবার্টের সাথেই পরীক্ষা দিতে হবে। পড়াশোনায় পিছিয়ে পড়তে লাগলো মিলেইভা। অ্যালবার্ট যেন দেখেও দেখেনা মিলেইভার পিছিয়ে পড়া। মিলেইভার কয়েকজন মেয়ে বন্ধু মিলেইভাকে বোঝাতে এসেছিল যে অ্যালবার্ট মিলেইভার দুর্বলতার সুযোগ নিচ্ছে। মিলেইভা সেই বন্ধুদেরও এড়িয়ে চলে এখন। ১৯০০ সালের জুনে তাদের ফাইনাল পরীক্ষা। পাস করতে হলে ছয় পয়েন্টের মধ্যে পাঁচ পয়েন্ট পেতে হয়। অ্যালবার্ট পেয়েছে চার দশমিক নয় পয়েন্ট; সেটাকে পাঁচ পয়েন্ট ধরে অ্যালবার্ট পাস করে গেলো। কিন্তু মিলেইভা পাস করতে পারলো না। সে পেয়েছে মাত্র চার পয়েন্ট। অথচ অ্যালবার্টের সাথে ঘনিষ্ঠতার আগে সে ছয়ের মধ্যে সর্বোচ্চ পাঁচ দশমিক পাঁচ পেয়ে ফার্স্ট হয়েছিল।

৮

চাকরি খুঁজছে অ্যালবার্ট। কিন্তু তার রেজালট খুব একটা ভালো না হওয়াতে কোথাও সুযোগ হচ্ছেনা। তাছাড়া পলিটেকনিকে তার থিসিস এডভাইজার প্রফেসর হেনরিখ ওয়েবারের সাথে তার সম্পর্ক খুব খারাপ। অ্যালবার্টের ধারণা ওয়েবারের জন্যই তার চাকরি হচ্ছে না কোথাও। এদিকে মিলেইভার জন্যও একধরনের মানসিক চাপ অনুভব করছে সে। মায়ের সাথেও

কয়েকবার ঝগড়া হয়ে গেছে এব্যাপারে। মিলেইভা পাস করতে না পারাতে বেশ মন খারাপ করে আছে। অ্যালবার্ট কী করবে বুঝতে পারছে না। মিলেইভা এরমধ্যেও সাপোর্ট দিয়ে যাচ্ছে অ্যালবার্টকে। সে একটা ল্যাবোরেটরি এসিস্ট্যান্টের কাজ নিয়েছে।

১৯০১ সালের প্রথম দিকে অ্যালবার্ট চলে গেলো মিলানে। যদি সেখানে কোন কাজ জোটে। মিলেইভা আবার প্রস্তুতি নিচ্ছে পরীক্ষার। এবার তাকে পাস করতেই হবে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে সাপ্তাহিক ছুটির দিনে অ্যালবার্ট এসে হাজির হচ্ছে। সময় চলে যাচ্ছে। অ্যালবার্টের সঙ্গ তার ভালো লাগে আবার পড়াশোনার ক্ষতি হচ্ছে ভেবেও উতলা হয়। অ্যালবার্ট এলে তার সাথে বেড়াতে যেতে হয়। এপ্রিলে অ্যালবার্ট তাকে নিয়ে গেলো কোমো হ্রদে। হ্রদের স্বচ্ছ জলে নৌকায় চড়লো। রডোডেন্ড্রন আর ক্যামেলিয়া ফুলে ভরা এক বাগান ঘেরা বাড়িতে কাটালো কয়েকরাত। কয়েকদিনের জন্য মিলেইভা যেন ভুলেই গেলো যে দুমাস পরেই তার পরীক্ষা। অ্যালবার্টকে একটু বেশিই প্রশ্রয় দিয়ে ফেললো সে।

কিছুদিন পরেই বাবার চিঠি পেলো মিলেভা। পরীক্ষায় খারাপ করায় খুব মনখারাপ করেছেন তিনি। তাছাড়া অ্যালবার্টের সাথে সম্পর্কটা নিয়েও তিনি সন্তুষ্ট নন। মনটা খুব খারাপ হয়ে গেলো মিলেইভার। পরীক্ষার আর কয়েক সপ্তাহ বাকী। শরীর খারাপ লাগতে শুরু করেছে মিলেইভার। বুঝতে পারলো সে গর্ভবতী। কুমারী মাতা শব্দটি ইউরোপের মধ্যবিত্ত সমাজে অস্পৃশ্য। জানাজানি হয়ে গেলে টি টি পড়ে যাবে চার দিকে। অ্যালবার্টকে বিয়ে করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই তার। অ্যালবার্টকে চিঠি লিখে জানালো সে। কিন্তু অ্যালবার্ট কোনরকম সিদ্ধান্তই জানালো না, যেন সব দায়িত্ব তার একার। অ্যালবার্ট আর এলো না জুরিখে। প্রচন্ড মানসিক ও শারীরিক চাপ নিয়ে পরীক্ষা দিলো মিলেইভা। কিন্তু এবারো পাস করতে পারলোনা। আরেকবার যে চেষ্টা করবে সে সুযোগ আর নেই। পেটের শিশু বড় হচ্ছে। মিলেভার জ্ঞানবিজ্ঞানের জগতে থাকার স্বপ্নের মৃত্যু হলো।

অ্যালবার্টের মা পলিন মিলেইভার নামে কুৎসা রটাতে লাগলেন। অ্যালবার্ট মিলেভার খবর জানার পরে আর একবারও দেখা করেনি তার সাথে। একবার দেখা হলেও হয়তো মনে কিছু বল পেতো মিলেইভা। মিলেইভাকে চলে যেতে হলো তার মায়ের কাছে সার্বিয়ায়। অ্যালবার্ট সেপ্টেম্বরে সুইজারল্যান্ডের একটি স্কুলে অত্যন্ত কম বেতনের একটি চাকুরিতে যোগ দিয়েছে। মিলেইভার কাছে আসার কোন আগ্রহই যেন আর নেই তার। চিঠিপত্রের সংখ্যাও কমে যেতে লাগলো। নভেম্বর মাসে বাড়ির কাউকে কিছু না জানিয়ে মিলেইভা সুইজারল্যান্ডগামী ট্রেনে চেপে বসলো। অ্যালবার্টকে চিঠি লিখে জানিয়েছে তার আসার কথা। সাতমাসের গর্ভবতী মিলেইভার কথা জানাজানি হয়ে গেলে চাকুরীক্ষেত্রে অ্যালবার্টের অসুবিধা হতে পারে ভেবে অ্যালবার্টের কর্মস্থল থেকে কয়েকমাইল দূরে একটা হোটেলে উঠলো মিলেভা। দুদিন অপেক্ষা করার পরেও অ্যালবার্ট আসেনি সেখানে। বাড়িতে ফিরে আসতে হলো মিলেইভাকে। ডিসেম্বরে অ্যালবার্ট সুইস পেটেন্ট অফিসে কেরানির পদে যোগ দিলো। বিয়ে করে খরচ চালানো যাবে এই বেতনে। ১৯০২ সালের জানুয়ারিতে মিলেভা একটি ফুটফুটে কন্যার জন্ম দিলো। অ্যালবার্ট আইনস্টাইন আর মিলেইভা মেরিকের বিবাহ বহির্ভূত সন্তান লিজেল। অ্যালবার্ট কোনদিনই দেখেনি তার এই মেয়েকে। দেখার কোন আগ্রহও প্রকাশ করেনি। পরবর্তীতে লিজেলের কী হয়েছে তা আজো জানা যায়নি। চাকুরি পাবার পরে অ্যালবার্ট লিখেছে মিলেইভাকে খুব শিগ্রই বিয়ে করবে। কিন্তু তার পরেও প্রায় একবছর অপেক্ষা করতে হয়েছে মিলেইভাকে।

৯

এলবার্ট-মিলেভার বিয়ের ছবি (১৯০৩)

১৯০৩ সালের জানুয়ারির ৬ তারিখে বিয়ে হয় অ্যালবার্ট আইনস্টাইন আর মিলেইভা মেরিকের। অ্যালবার্টের বয়স তখন চব্বিশ আর মিলেইভার আটাশ। শুরু হলো অ্যালবার্ট-মিলেইভার দাম্পত্য জীবন। অ্যালবার্ট সপ্তাহের ছয়দিন ব্যস্ত থাকে অফিসের কাজে আর ছুটির দিনে ব্যস্ত থাকে পদার্থবিজ্ঞানের গবেষণায়। বাড়ির কাজকর্ম আর অ্যালবার্টের দৈনন্দিন জাগতিক ও জৈবিক চাহিদা মেটানো ছাড়া মিলেইভার সাথে অ্যালবার্টের আর কোন মানসিক যোগাযোগই ঘটে না। লিজেলের কোন উল্লেখও নিষিদ্ধ এখানে। লিজেলের দায়িত্ব নেন মিলেইভার মা-বাবা। সেবছর পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরষ্কার পেয়েছেন মিলেইভার একসময়ের আদর্শ মেরিয়া স্লোদভস্কা; বিয়ের পরে যিনি মেরি কুরি হয়েছেন। দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে মিলেইভার। তবুও আশা আছে অ্যালবার্টের কাজ যুগান্তকারী হবে। অ্যালবার্ট একদিন অনেক বড় হবে তাতে মিলেইভার কোন সন্দেহ নেই। পরের বছর জন্ম নিলো অ্যালবার্ট আইনস্টাইন দম্পতির প্রথম সন্তান হ্যান্স অ্যালবার্ট। ১৯০৫ সালে অ্যালবার্টের প্রমোশন হলো অফিসে। চারটি সায়েন্টিফিক পেপার পাবলিস করলো এলবার্ট। এই পেপারগুলোই পরবর্তীতে পুরা পৃথিবীর পদার্থবিজ্ঞানকে নতুন ভাবে ঢেলে সাজাবার ব্যবস্থা করে দেয়।

১০

দ্রুত বিখ্যাত হয়ে যাচ্ছেন আইনস্টাইন। পরের বছর ইউনিভার্সিটি অব জুরিখ থেকে পিএইচ-ডি অর্জন করলেন তিনি। ১৯০৮ সালে সেই ইউনিভার্সিটিতে যোগ দিলেন লেকচারার পদে। পরের বছরই থিওরেটিক্যাল ফিজিক্সের প্রফেসর হয়ে গেলেন। মিলেইভা খুশি তার 'জনি'র এই উন্নতিতে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে প্রফেসর আইনস্টাইনের জীবনে নতুন নারীর আবির্ভাব ঘটছে। ব্যাপারটা মিলেইভা বুঝতে পারছেন, কিন্তু ধরতে পারছেন না। ধরতে পারছেন না তাও বলেন কীভাবে? অ্যালবার্টের কাছে আসা একটি চিঠি তার হাতে পড়েছে। অ্যানেলি মেয়ার-স্মিথ নামের মেয়েটির চিঠি পড়ে বোঝা যাচ্ছে অ্যালবার্টও তাকে চিঠি লেখে। অ্যালবার্টকে দেখা করতে লিখেছে অ্যানেলি। লেখা পড়ে কেমন যেন গোপন প্রণয়ের গন্ধ পাচ্ছেন মিলেইভা। অ্যালবার্ট তাকে কোনদিনই বলেনি অ্যানেলির কথা। অ্যালবার্টকে জিজ্ঞাসা করেও কোন সদুত্তর পাওয়া গেলো না। মিলেইভা খবর নিয়ে জেনেছেন জর্জ মেয়ার নামে এক উকিলের বৌ এই অ্যানেলি। মিলেভা একটা চিঠি লিখলেন জর্জ মেয়ারকে তার বৌকে সামলানোর জন্য। রাগের মাথায় লেখা চিঠিটা একটু বেশি কড়া হয়ে গেছে। অ্যালবার্ট জানতে পারলেন মিলেইভার চিঠির কথা। অন্য কোন উপায় না থাকলে পুরুষরা স্ত্রীর উপর রেগে যান। অ্যালবার্টও রেগে গেলেন। তিনি তো মিলেইভাকে বলতে পারেন না যে অ্যানেলির সাথে অ্যালবার্টের পরিচয় সেই জুরিখের পলিটেকনিকে পড়ার সময়। অ্যানেলির দিদির বাসায় তুমুল আড্ডা চলতো তখন। সতেরো বছরের উচ্ছল সুন্দরী অ্যানেলিকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল ঊনিশ বছরের অ্যালবার্ট। মিলেইভার সাথেও তখন প্রেম চালিয়ে যাচ্ছে অ্যালবার্ট। তাই অ্যানেলির খাতায় কয়েক লাইন কবিতা লিখে দেয়া আর সুযোগ বুঝে কয়েকটা চুমুর বেশি এগোতে পারেনি তখন। এখন এতবছর পরে অ্যালবার্টের খবর পেয়ে যোগাযোগ করেছে অ্যানেলি। অ্যালবার্ট গোপনে অন্তরঙ্গ সময় কাটায় মাঝে মাঝে অ্যানেলির সাথে। তা তো বলা যায় না মিলেইভাকে। ছোটখাট ঝগড়া হতে লাগলো। আইনস্টাইন সমস্যার সমাধান করতে চাইলেন অন্যভাবে। মিলেইভা আবার গর্ভবতী হলেন। ১৯১০ সালে তাঁদের ২য় পুত্র এডোয়ার্ডের জন্ম হলো। এদিকে প্রায় একই সময়ে অ্যানেলির একটি কন্যা সন্তান হয়। অনেকেই মনে করেন অ্যানেলির কন্যা এরিকার জন্মদাতা স্বয়ং অ্যালবার্ট আইনস্টাইন । পরের বছর আইনস্টাইন জার্মান ইউনিভার্সিটি অব প্রাগে যোগ দিলেন। আইনস্টাইন পরিবার প্রাগে এলো সাথে সমস্যাও এলো নতুন করে। এলসার আবির্ভাব ঘটলো আইনস্টাইনের জীবনে।

১১

অ্যালবার্টের বাবার বাবা আব্রাহাম আর এলসার বাবার বাবা রাফেল আপন ভাই। আর অ্যালবার্টের মা পলিন আর এলসার মা ফ্যানি আপন বোন। কাছের অর্ডারে প্রাধান্য দিলে এলসা অ্যালবার্টের আপন মাসতুতো বোন। এলসা অ্যালবার্টের চেয়ে তিন বছরের বড়। বিশ বছর বয়সে এলসা বিয়ে করে টেক্সটাইল মার্চেন্ট ম্যাক্স লোয়েনথালকে। তাদের ঘরে দুই কন্যা আইলস আর মারগট। একপুত্রও জন্মেছিল, কিন্তু বাঁচেনি। ১৯০৮ সালে ম্যাক্সকে ডিভোর্স করে এলসা এখন বার্লিনে তার মা বাবার অ্যাপার্টমেন্টের উপর তলায় থাকে। অ্যালবার্টের উন্নতির খবর এখন যে কোন সোশাল পার্টিতেই আলোচিত হয়। এলসার এখন কাউকে খুব দরকার, তার মেয়েদের জন্য এবং তার নিজের জন্যেও বটে। এলসা চিঠি লিখলো অ্যালবার্টকে। অ্যালবার্ট হঠাৎ আবিষ্কার করলো এলসা মিলেইভার চেয়ে অনেক বেশি সুন্দরী, অনেক বেশি স্মার্ট। বার্লিনে আসার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন আইনস্টাইন। জুরিখের পলিটেকনিকে একবছর প্রফেসরি করে ১৯১৪ সালে বার্লিন ইউনিভার্সিটিতে যোগ দিলেন অ্যালবার্ট। মিলেইভা চাননি অ্যালবার্ট বার্লিনে আসুক। কিন্তু মিলেইভার ইচ্ছা অনিচ্ছার কোন মূল্যই নেই তখন অ্যালবার্টের কাছে।

আইনস্টাইন পরিবার বার্লিনে এলো এপ্রিলে। এখানে পার্টিতে আইনস্টাইনের পাশে মিলেইভার বদলে দেখা যেতে লাগলো

একটু বেশি মাত্রায় সাজগোজ করা বেশি মাত্রায় উচ্ছল আটত্রিশোর্ধ এলসাকে। মিলেইভার কানে সব কথাই আসে, নানা রকম ভাবে পল্লবিত হয়েই আসে। কিন্তু মিলেইভার কোন কথাই অ্যালবার্টের কানে ঢোকে না। বরং মিলেইভার জন্য লম্বা এক 'কোড অব কন্ডাক্ট' তৈরি করলেন অ্যালবার্ট আইনস্টাইন। অ্যালবার্ট লক্ষ্য করেছেন কিছুদিন থেকে ডাকলেও সাড়া দেয় না মিলেইভা। তাঁর কোড অব কন্ডাক্টে মিলেইভার উদ্দেশ্যে এটাও জুড়ে দিলেন, 'আমি ডাকার সাথে সাথেই সাড়া দিতে হবে তোমাকে।' এ যেন যুদ্ধ ঘোষণা করা মিলেইভার সাথে। এদিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে আগস্টে। বার্লিন আর নিরাপদ নয় বলে আইনস্টাইন ছেলেদের সহ মিলেইভাকে পাঠিয়ে দিলেন জুরিখে। অ্যালবার্ট রয়ে গেলেন বার্লিনে। যেখানে বাসা নিলেন সেখান থেকে দেখা যায় এলসার অ্যাপার্টমেন্ট। মিলেইভা অ্যালবার্টের জন্য অপেক্ষা করলেও আইনস্টাইন সময় করতে পারেন না স্ত্রী বা সন্তানদের দেখতে যাবার। বরং মিলেইভার কাছে ডিভোর্স দাবী করলেন। মিলেইভা অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হলেন। এ খবর পেয়ে আইনস্টাইন ভাবলেন মিলেইভা ভান করছে।

১২

মিলেইভা বুঝতে পারছেন না কী করবেন। ছেলেদের খরচ জোগাবেন কীভাবে। ইউনিভার্সিটির ডিগ্রি নেই তার। স্কুল পাসের সার্টিফিকেট দেখিয়ে কোন চাকরী তিনি পাবেন না। তাছাড়া শরীর খারাপ থাকে প্রায়সময়। ওদিকে আইনস্টাইন তখন আরো উন্নতি করছেন। ইউরোপিয়ান ফিজিক্যাল সোসাইটির প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন, জেনারেল থিওরি অব রিলেটিভিটির পেপার প্রকাশিত হয়েছে। ফিজিক্সে নোবেল পুরস্কার পাওয়াটা এখন শুধুমাত্র সময়ের ব্যাপার। অনেক ভাবলেন মিলেইভা। তার প্রিয় জনিকে তিনি আর ধরে রাখতে পারবেন না। অ্যালবার্ট তাকে বিয়ে করেছে শুধুমাত্র কর্তব্যের খাতিরে। তাহলে ছেলেদের মানুষ করার কর্তব্যও সে করবে। অ্যালবার্ট ডিভোর্স চাচ্ছে। তার বিনিময়ে মিলেইভা চাইবে অ্যালবার্টের নোবেল পুরস্কারের টাকা। যদিও নোবেল পুরস্কার সে পাবে কিনা বা কখন পাবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। মিলেইভার শর্তে রাজী না হয়ে উপায় ছিলো না অ্যালবার্টের।

মিলেভা ডিভোর্সে রাজী হয়েছে। কাগজ পত্র তৈরি করা আর নতুন বিয়ের প্রস্তুতি চললো। এলসাকে বিয়ে করবেন ভাবতে যে রকম রোমাঞ্চ অনুভব করা উচিত সে রকম রোমাঞ্চ অনুভব করছেন না অ্যালবার্ট। তার মন টানছে এলসার মেয়ে আইল্স। বিশ বছরের সুন্দরী আইল্সকে দেখলে একধরনের শারীরিক আকর্ষণ অনুভব করেন অ্যালবার্ট। আইল্সকে সে কথা বলেছেনও তিনি। আইল্স যদিও রুডল্ফ কেইজারের সাথে প্রেম করছে, কিন্তু আইনস্টাইনের প্রতিও তার আকর্ষণ কম নয়। এলসাকে জানিয়ে দিয়েছেন অ্যালবার্ট - মা বা মেয়ে যে কাউকে বিয়ে করতে তার কোন আপত্তি নেই। তারা মা-মেয়ে আলোচনা করে যেন ঠিক করে নেয় কে বিয়ে করবে অ্যালবার্টকে। এলসার জন্য এ যে কত বড় অপমানজনক কথা তা যেন অ্যালবার্ট বুঝতেই পারছেন না। এলসার ইচ্ছে হলো না মেয়ের স্যাথে প্রতিযোগিতায় নামতে। আইল্স-এর উপর ছেড়ে দিলেন তিনি সিদ্ধান্তের ভার। আইল্স বুঝতে পারলো মায়ের মনোভাব। সে তার মাকে জায়গা ছেড়ে দিলো। **১৯১৯** সালে অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের সাথে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে গেলো মিলেইভা মেরিকের। অ্যালবার্ট সেদিনের তারিখটার দিকে নজরই দিলেন না। সেদিন ছিল চৌদ্দই ফেব্রুয়ারী। ভ্যালেন্টাইনস ডে। এই দিনে ভালোবাসার মানুষ কাছে আসে। কিন্তু তারা চিরদিনের মতো দূরে সরে গেলেন।

১৩

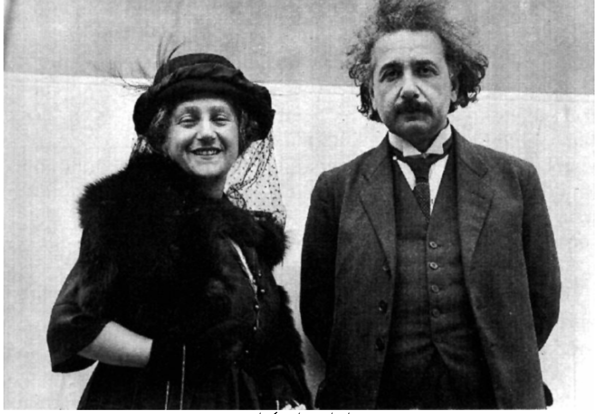

এলসা- এলবার্ট আইনস্টাইন (১৯২০)

মিলেইভার সাথে ডিভোর্সের চারমাস পরে অ্যালবার্ট বিয়ে করলেন এলসাকে। এলসা মিশ্র অনুভূতি নিয়ে আইনস্টাইনের ঘর করতে শুরু করলেন। অ্যালবার্টকে তিনি ঠিক বিশ্বাস করতে পারেন না। তার দুই মেয়ে তাদের সাথে আছে। তাদের নিয়েও তার চিন্তা। অ্যালবার্ট জড়িয়ে পড়েছেন ইহুদিদের আলাদা রাষ্ট্রের ধারণার সাথে। জার্মানিতে সাম্প্রদায়িকতা দানা বাঁধছে। ১৯২১ সালে অ্যালবার্ট আর এলসা আমেরিকা ভ্রমণে গেলেন। এলসা চোখে চোখে রাখেন অ্যালবার্টকে যতটুকু পারেন। রেস্টুরেন্টের ঘামে ভেজা ওয়েট্রেসদের প্রতিও আইনস্টাইনের আকর্ষণ চোখে পড়ে এলসার। ১৯২২ সালে ঘোষণা করা হলো ১৯২১ সালের পদার্থবিজ্ঞানের নোবেল পুরস্কার দেয়া হয়েছে অ্যালবার্ট আইনস্টাইনকে। আইনস্টাইন কথা রেখেছেন। নোবেল পুরস্কারের এক লাখ একুশ হাজার পাঁচ শ বাহাত্তর সুইডিশ ক্রোনার পাঠিয়ে দিলেন মিলেইভাকে। মিলেইভা সেই টাকায় তিনটি বাড়ি কিনে তার একটিতে ছেলেদের নিয়ে থাকেন।

১৪

আইনস্টাইন এখন বিশ্ববিখ্যাত সেলিব্রিটি। পৃথিবীর নানা জায়গার বিখ্যাত সব মানুষের সাথে পরিচয় ঘটছে রেগুলার। এসময় বন্ধু হ্যান্স বুশামের ভাগ্নি বেটি নিউম্যানের প্রতি দুর্বল হয়ে গেলেন অ্যালবার্ট। সেই মেয়েকে নিজের কাছে রাখার জন্য আইনস্টাইন তাকে নিজের সেক্রেটারি নিযুক্ত করলেন। লোক হাসাহাসি করতে চাইলেন না এলসা। সপ্তাহে দুদিনের বেশি দেখা করবে না এই শর্তে সেক্রেটারিকে মেনে নিলেন এলসা। একবছরের মধ্যেই সেক্রেটারির প্রতি সমস্ত আকর্ষণ হারিয়ে ফেললেন অ্যালবার্ট। এবার কিছুদিন এলসাকে ফাঁকি দিয়ে মার্গারেট লেনবাখ নামে এক অস্ট্রিয়ান মহিলার সাথে সময় কাটালেন আইনস্টাইন। মার্গারেটের পরে টনি মেন্ডেল নামের মহিলা তার গাড়ি পাঠাতে লাগলো অ্যালবার্টের অফিসে। অ্যালবার্ট অফিসের পরে রাতের শোতে থিয়েটারে যেতে লাগলেন টনির সাথে। কিন্তু কিছুদিন পরে হার্টের সমস্যা দেখা দিলো আইনস্টাইনের। ডাক্তারের পরামর্শে একবছর বেডরেস্টে থাকতে হলো তাঁকে। এসময় তাঁর সেক্রেটারি হয়ে এলেন হেলেন ডুকাস। ছিপছিপে লম্বা প্রচন্ড ব্যক্তিত্বময়ী যুবতী হেলেনের সাথে এলবার্টের যখন প্রথম দেখা হয় তখন তিনি অসুস্থ হয়ে শুয়ে আছেন বিছানায়। কাজ বুঝে নিতে একটুও সময় লাগলো না হেলেনের। কাজের সাথে সাথে আইনস্টাইনের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ এখন হেলেনের হাতে। আইনস্টাইনের ব্যক্তিগত চিঠিও হেলেন আগে পড়ে। বেশির ভাগ চিঠির উত্তরও হেলেনই দিয়ে দেয় আইনস্টাইনের হয়ে। হেলেনকে এড়িয়ে সাংবাদিকরাও দেখা করতে পারে না আইনস্টাইনের সাথে। আইনস্টাইনের জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত হেলেন ছিলেন তাঁর সাথে। বিয়েও করেননি হেলেন।

১৫

১৯৩৩ সালে জার্মানিতে নাৎসিরা ক্ষমতায় আসার পরে দেশ ছাড়তে হলো আইনস্টাইনকে। ইউরোপ হয়ে আমেরিকায় এসে পৌঁছালেন এলসা, অ্যালবার্ট আর হেলেন। অনেক দিন রোগে ভুগে ১৯৩৬ সালে মারা গেলেন এলসা। এলসার মৃত্যুর পরে আর বিয়ে করেননি আইনস্টাইন। বিবাহ ব্যবস্থার প্রতিই আস্থা নেই আইনস্টাইনের। বিভিন্ন জনের কাছে তিনি বলতে শুরু করেছেন 'মানুষ কখনোই একজনের প্রতি সারাজীবন বিশ্বস্ত থাকতে পারেনা। প্রত্যেক বিবাহিত পুরুষই মনে মনে পরনারীতে আসক্ত আর প্রত্যেক বিবাহিত রমণীই অন্য পুরুষকে কামনা করে।' আইনস্টাইনের সমস্ত দায়িত্ব এসে পড়লো হেলেনের হাতে। আইনস্টাইনের মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সাথে ছিলেন হেলেন ডুকাস। ১৯২৮এর এপ্রিল থেকে ১৯৫৫ এর এপ্রিল পর্যন্ত দীর্ঘ ২৭ বছর। আইনস্টাইনের দুই স্ত্রীর কেউই এত দীর্ঘ সময় আইনস্টাইনের সাথে ছিলেন না বা থাকতে পারেন নি। অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের প্রথম প্রেমিকা মেরি বিয়ে করেছিলেন অ্যালবার্ট নামেরই একজনকে ১৯১১ সালে। এই অ্যালবার্ট মুলার ছিলেন একটি ঘড়ি কোম্পানির ম্যানেজার। তাদের দুইটি ছেলেমেয়ে। কিন্তু এই বিয়ে বেশিদিন টেকেনি। ১৯২৭ সালে তাদের বিচ্ছেদ হয়ে যায়। ১৯৪০ সালে মেরি আইনস্টাইনকে লিখেছিলো আমেরিকায় ইমিগ্রেশানের ব্যাপারে সাহায্য করতে। কিন্তু আমেরিকায় আসা হয়নি মেরির। পাগল হয়ে যায় মেরি। ১৯৫৭ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত একটা এসাইলামে থাকতে হয় তাকে। মিলেইভা মেরিকের মৃত্যু হয় ১৯৪৮ সালে। ১৯৫৫ সালের ১৮ এপ্রিল আইনস্টাইনের মৃত্যুর পরে দেখা গেলো আইনস্টাইন তাঁর দুই ছেলেকে যা দিয়ে গেছেন তার চেয়ে অনেক বেশি দিয়ে গেছেন সেক্রেটারি হেলেন ডুকাসকে।

তথ্যসূত্রঃ

1. Barry Parker, *"Einsten- the Passions of a Scientist",* Prometheus Books, New York, 2003.
2. Alice Calaprice, *"The Expanded Quotable Einstein",* Princeton University Press, Princeton, 2000.
3. Alice Calaprice, *"The Einstein Almanac",* The Johns Hopkins University Press,

Baltimore, 2005.
4. Alan Axelrod, Ph.D., *"Science A.S.A.P."*,Prentice Hall Press, New York, 2003.
5. Ronald W. Clark, *"Einstein The Life and Times"*, Avon, New York, 1972.
6. *"Collected Papers of Albert Einstein. Vols. 1-9,* Princeton University Press, New Jersey, 1986-2004.
7. Albert Einstein, *"Ideas and Opinions"*, Crown, New York, 1954.
8. Dennis Overbye, *"Einstein in Love: A Scientific Romance"*, Viking, New York, 2000.
9. Milan Popovic, *"In Albert's Shadow: The Life and Letters of Mileva Maric, Einstein's First Wife",* Johns Hopkins University Press, Baltimore, 2003.
10. Roger Highfield and Paul Carter, *"The Private Lives of Albert Einstein"*, St. Martin's Press, New York, 1993.
11. Mary Gribbin and John Gribbin, *"Time & Space",* Dorling Kindersley, New York, 1994.
12. *"Albert Einstein and Mileva Marić: The Love Letters".* Translated by: Shawn Smith, Edited by: Jurgenn Renn and Robert Schulmann, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1992.
13. Ioan James, *"Remarkable Physicists From Galileo to Yukawa",* Cambridge University Press, UK, 2004.
14. *"Dear Professor Einstein",* Foreword by Evelyn Einstein, Edited by Alice Calaprice, Prometheus Books, New York, 2002.

১৫। *আইনস্টাইনের কাল*, প্রদীপ দেব, মীরা প্রকাশন, ঢাকা, বাংলাদেশ, ২০০৬।